



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 848 - 855

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সাঁওতালি লোকসংস্কৃতিতে পরিবেশচেতনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ

ছোটু টুডু

SACT, সাঁওতালি বিভাগ

শরৎ সেন্টেনারি কলেজ

Email ID: chhatutudu4@gmail.com

 0009-0008-6968-9615

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Santali Folk
Culture;
Environmental
Consciousness;
Nature
Conservation;
Indigenous
Knowledge;
Sacred Groves;
Folk Rituals.

Abstract

Santali folk culture, rooted in the indigenous worldview of the Santals of eastern and central India, presents a profound and sustainable relationship between human life and nature. This paper explores the environmental consciousness embedded in Santali folk traditions, beliefs, rituals, festivals, oral literature, and customary practices, highlighting their relevance in contemporary ecological discourse. The Santals perceive nature not merely as a resource but as a living entity endowed with spiritual significance. Forests, rivers, hills, animals, and plants are revered as sacred components of the cosmic order, governed by ancestral spirits and village deities such as Marang Buru, Jaher Era.

Through an analysis of folk songs, myths, agricultural rituals, and seasonal festivals like Sohrai, Baha, karam and Erok Sim, this study demonstrates how Santali cultural practices promote biodiversity conservation, sustainable use of natural resources, and ecological balance. Traditional agricultural systems emphasize coexistence with nature, avoiding overexploitation and encouraging regenerative practices. Sacred Place (Jaher Than) function as community-protected ecological zones, ensuring the preservation of flora and fauna. Folk narratives and proverbs transmit ethical values of restraint, respect, and responsibility toward the environment across generations.

In the face of modern industrialization, deforestation, mining, and climate change, Santali folk ecological knowledge offers alternative models of environmental stewardship grounded in cultural ethics rather than legal enforcement alone. This paper argues that indigenous knowledge systems such as Santali folk culture are not archaic but dynamic and essential for sustainable development. Recognizing and integrating these cultural perspectives into contemporary environmental policies can contribute significantly to global conservation efforts.

By situating Santali folk culture within the broader framework of eco-criticism and indigenous environmental philosophy, the study underscores the importance of cultural diversity in addressing present-day ecological crises. The research ultimately calls for greater academic attention, documentation, and policy-level acknowledgment of indigenous environmental wisdom as a vital resource for humanity's ecological future.

Discussion

ভূমিকা : আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ বিপর্যয়, বননিধন, জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্রের সংকট আজ বৈশ্বিক উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে আদিবাসী সমাজের জীবনদর্শন ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে নিহিত পরিবেশচেতনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারতের অন্যতম প্রাচীন আদিবাসী গোষ্ঠী সাঁওতালদের লোকসংস্কৃতিতে প্রকৃতি শুধু জীবন ধারণের উপকরণ নয়, বরং ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাঁওতালি লোকসংস্কৃতি প্রকৃতির সং মানুষের সহাবস্থানের এক ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে, যা আধুনিক পরিবেশ-সংরক্ষণ ভাবনার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত।

সাঁওতাল সমাজে বন, পাহাড়, নদী, পশু-পাখি ও গাছপালাকে জীবন্ত সত্তা হিসেবে কল্পনা করা হয়। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে মারাং বুরু, জাহের এরা, গোসাঁই এরা প্রভৃতি দেবদেবী প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের প্রতীক। এই দেবতাদের পূজা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সংরক্ষণমূলক মনোভাবের প্রকাশ। নৃবিজ্ঞানী কে. এস. সিং উল্লেখ করেছেন-

“যে সাঁওতালদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রকৃতির উপর আধিপত্য নয়, বরং সহাবস্থানের নীতিকে প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে সাঁওতাল সমাজে বননিধন বা প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার সামাজিকভাবে নিরুৎসাহিত।”^১

সাঁওতালি লোকগান, লোককথা, পূজা, ও নৃত্যে পরিবেশচেতনার সুস্পষ্ট প্রতিফলক দেখা যায়। বাহা পরব, সোহরাই পরব কিংবা এরঃ সিম, কারাম পরব মূলত ঋতুচক্র, কৃষিকাজ ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত উৎসব। এসব উৎসবে প্রকৃতির পুনর্জীবন, ফসল উৎপাদন ও জীবনের ধারাবাহিকতাকে উদযাপন করা হয়। সোমা মুরমু মন্তব্য করেছেন-

“যে সাঁওতালি লোকগান প্রকৃতিকে ‘মাতা’ হিসেবে কল্পনা করে এবং মানুষকে তার সন্তান রূপে চিহ্নিত করে।”^২

এই ভাবনা মানুষকে প্রকৃতির ক্ষতি না করে তার রক্ষণাবেক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে।

লোককথাগুলিতেও পরিবেশ-সংরক্ষণের নৈতিক শিক্ষা নিহিত রয়েছে। বহু কাহিনিতে দেখা যায়, বন বা নদীর অবমাননা করলে দেবতার ক্রোধ নেমে আসে, আবার প্রকৃতির যত্ন নিলে সমাজের সমৃদ্ধি আসে। এই কাহিনিগুলি মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পরিবেশবান্ধব আচরণ শিক্ষা দেয়। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, - “আদিবাসী লোকসংস্কৃতি আসলে এক ধরনের প্রাকৃতিক নৈতিকতা গড়ে তোলে, যা লিখিত আইনের আগেই পরিবেশ সংরক্ষণের পথ নির্দেশ করে।”

অতএব বলা যায়, সাঁওতালি লোকসংস্কৃতি কেবল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নয়, বরং একটি সুসংহত পরিবেশ দর্শন। বর্তমান পরিবেশ সংকটের যুগে এই লোকজ্ঞান ও সংস্কৃতিক পুনর্মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই গবেষণাপত্রে সাঁওতালি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে পরিবেশচেতনা ও প্রকৃতি-রক্ষণের ধারণাকে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেওয়া হবে।

সাঁওতাল সমাজ ও প্রকৃতি-ভাবনা : সাঁওতাল সমাজের জীবনধারা প্রকৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বন, পাহাড়, নদী ও জমি - এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলিই তাদের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। সাঁওতালদের মতে, -

“প্রকৃতি জড় নয়, বরং প্রতিটি উপাদানের মধ্যে আত্মা বা ‘বংগা’-র উপস্থিতি রয়েছে।”^৩

এই বংগারাই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। সাঁওতাল ধর্মবিশ্বাসে মারাং বুরু হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা।

“তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও সমাজের নৈতিক রক্ষক হিসেবে পূজিত। বনভূমির রক্ষক হিসেবে পরিচিতি জাহের এরা সাঁওতালদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিকার, ফলমূল, লতাপাতা সংগ্রহ ও কৃষিকাজ সরাসরি বন, জমির উপর নির্ভরশীল। জলাশয় ও নদীরও নিজস্ব দেবতা রয়েছে, যাদের অসম্মান করলে খরা, রোগ বা দুর্যোগ নেমে আসে বলে বিশ্বাস করা হয়।”^৪

তাই সর্বসময় বন, লতাপাতা, গাছপালাকে সাঁওতালরা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

এই বিশ্বাস থেকেই সাঁওতাল সমাজে প্রকৃতি ধ্বংসকারী কাজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অকারণে গাছ কাটা, গর্ভবতী পশু হত্যা কিংবা জলাশয় দূষণ সামাজিক অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

“এমন কাজ করলে শুধু সামাজিক শাস্তিই নয়, দেবতাদের ক্রোধ নেমে আসবে - এই ভাবেই তাদের মনে ভয় কাজ করে।”^৫

ফলে ধর্মীয় বিশ্বাস একটি শক্তিশালী সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

আধুনিক পরিবেশবিদ্যার ভাষায়, সাঁওতালদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে টেকসই উন্নয়নের একটি প্রাথমিক রূপ বলা যায়। তারা প্রকৃতিকে ভোগের বস্তু নয়, বরং সহাবস্থানের সঙ্গী হিসেবে দেখে। বর্তমান বিশ্বে যখন পরিবেশ সংকট গভীরতর হচ্ছে, তখন সাঁওতাল সমাজের প্রকৃতি-কেন্দ্রিক জীবনদর্শন আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে। প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভয়মিশ্রিত বিশ্বাস যে কেবল ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং পরিবেশ সংরক্ষণের কার্যকর মাধ্যম - সাঁওতাল সমাজ তার জীবন্ত উদাহরণ।

জাহের থান ও পবিত্র বনভূমি : সাঁওতাল সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে ‘জাহের থান’ এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পবিত্র বনভূমি। প্রতিটি সাঁওতাল গ্রামে, সাধারণত গ্রামের প্রান্তে অবস্থিত এই জাহের থান প্রকৃতপক্ষে একটি সংরক্ষিত অরণ্য, যেখানে কোনও গাছ কাটা, পশু হত্যা কিংবা কৃষিকাজ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। সাঁওতালদের বিশ্বাস অনুযায়ী, এই স্থানে গ্রামের দেবদেবী ও পূর্বপুরুষদের আস্থা বাস করেন। “রামেশ্বর মুরমু মতে -

“সাঁওতাল সমাজে ‘জাহের থান’ সাধারণত প্রাকৃতিক বন বা ঘন গাছপালার জায়গায় স্থাপিত হয়, যেখানে দেবতা জাহের আয়ো ও অন্যান্য বোঁগা-র অবস্থান বিশ্বাস করা হয়।”^৬

ফলে লোকবিশ্বাস ও ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমেই এই বনভূমি শতাব্দী অক্ষত রয়েছে।

পরিবেশ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে জাহের থানকে পবিত্র বনভূমির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়। আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞান যেখানে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য Protected Area, Wildlife Sanctuary বা Community Conserved Area-র কথা বলে, সেখানে সাঁওতাল সমাজ বহু আগেই সামাজিক বিধি-নিষেধের মাধ্যমে সেই সংরক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে।

“মাধব গ্যাডগিল ও ভর্তা গুহ তাঁদের গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের বহু আদিবাসী সমাজ ধর্মীয় বিশ্বাসকে ব্যবহার করে বন ও জীবজগত রক্ষা করেছে।”^৭

জাহের থানগুলিতে বহু বিরল উদ্ভিদ, ঔষধি গাছ, পাখি, সরীসৃপ ও কীটপতঙ্গ নিরাপদে টিকে আছে। আশপাশের বনভূমি নষ্ট হয়ে গেলেও জাহের থান প্রায়শই একটি জীববৈচিত্র্যের দ্বীপ হিসেবে কাজ করে।

“পরিবেশবিদ রামচন্দ্র গুহ উল্লেখ করেছেন যে, এই ধরনের পবিত্র বনভূমি গুলি স্থানীয় পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।”^৮

সাঁওতাল সমাজে জাহের থান শুধুমাত্র পরিবেশ সংরক্ষণের স্থান নয়, বরং এটি সামাজিক ঐক্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কেন্দ্র। বার্ষিক উৎসব, পূজা ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও এই স্থানটির ভূমিকা অপরিণীম। এর ফলে পরিবেশ সংরক্ষণ কোনও বাহ্যিক আইন দ্বারা নয়, বরং সমাজের অভ্যন্তরীণ নৈতিক কাঠামোর মাধ্যমেই কার্যকর হয়। এই বিষয়টি আধুনিক টেকসই উন্নয়ন ধারণার সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সাঁওতালদের জাহের স্থান প্রমাণ করে যে, -

“আদিবাসী সমাজের প্রথাগত জ্ঞান (Traditional Ecological Knowledge) আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়।”^{১০}

বরং বর্তমান পরিবেশ সংকটের প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল সমাজের এই পবিত্র বনভূমি সংরক্ষণ পদ্ধতি আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার উৎস।

লোকউৎসব ও ঋতুচক্র : সাঁওতালি সমাজের লোকউৎসবগুলি মূলত কৃষিভিত্তিক জীবনধারা ও প্রকৃতির সঙ্গে অতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতি, ঋতুচক্র এবং মানবজীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক এই উৎসবগুলির মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। সাঁওতালদের কাছে উৎসব কেবল আনন্দের উপলক্ষ নয়, বরং প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা, দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রকাশের মাধ্যম। বাহা পরব, সহরাই পরব, কারাম এবং এরঃ সিম- এই গুলি প্রধান উৎসব সাঁওতালি জীবনে ঋতুচক্রের গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলিকে চিহ্নিত করে।

বসন্ত ঋতুতে পালিত ‘বাহা পরব’^{১১} বা ফুল-পাতার উৎসব প্রকৃতির নবজাগরণের প্রতীক। শাল, মছয়া ও অন্যান্য লতা-পাতা, ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে এই উৎসব পালিত হয়। সাঁওতাল বিশ্বাস অনুযায়ী, নতুন লতা-পাতা, ফুল ফোটা মানেই দেবতার আগমন। তাই গ্রামের জাহের থান-এ প্রথমে বাহা উৎসবের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি মাতা জাহের এরার নামে উৎসর্গ করা হয়। এই উৎসবের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির দানকে সন্মান জানায় এবং স্মরণ করে যে মানুষের জীবন প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

বর্ষার সুরুরে শস্য রোপনের সময় কারাম এবং বর্ষার শেষে ও শস্য ঘরে ওঠার পর পালিত হয় সহরাই পরব, যা ফসলের উৎপাদন উৎসবও বলা চলে। এই উৎসব কৃষকের কঠোর পরিশ্রমের সাফল্য উদযাপন করে। গৃহপালিত পশুদের বিশেষভাবে স্নান করানো, সাজানো, নাচ, গান এবং পূজা করা হয়, কারন কৃষিকাজে পশুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন ফসল দেবতাকে উৎসর্গ না করে ভোগ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ - এই নিয়মের মাধ্যমে সংযত ও কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দেওয়া হয়।

অন্যদিকে এরঃ সিম হল রপন উৎসব, যা নতুন কৃষিবর্ষের সূচনা নির্দেশ করে। এই সময়ে জমিতে বীজ রপনের আগে দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয় যেন ফসল ভালো হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ না আসে। এটি সাঁওতালদের ভবিষ্যৎ চিন্তা ও পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় দেয়। এই সমস্ত উৎসবের মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সাঁওতালি সমাজে প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ববোধ, চেতনা এবং নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। উৎসবগুলি শিক্ষা দেয় যে মানুষ প্রকৃতির অধিপতি নয়, বরং তার অংশমাত্র। আধুনিক পরিবেশ সংকটের প্রেক্ষাপটে সাঁওতালি লোকউৎসব ও ঋতু চক্রভিত্তিক জীবনদর্শন আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

লোকগান, বাঁখেড় (মন্ত্র), কাহিনি ও প্রবাদে পরিবেশচেতনা : সাঁওতালি লোক সাহিত্য আদিবাসী সমাজের পরিবেশ চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক নথি। লোকগান, লোককথা, মন্ত্র ও প্রবাদে প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়, বরং মানবজীবনের সহচর ও নৈতিক নিয়ামক হিসেবে উপস্থিত। বন, নদী, পাহাড়, পশু-পাখির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এখানে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে নির্মিত। ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র টুডু-র মতে -

“তালা রাচারে সারজম, মাতকম আর সেকরেচ ডৌর বিদ কাতে সিরিবারি ক বেনাওআ।”^{১২}

অর্থাৎ সাঁওতালি বিবাহ আচারেরে শাল, মল্লয়া গাছের সঙ্গে রেখে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় আর তাই সেই গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা খুব দরকার। সাঁওতালি লোকগানগুলিতে ঋতুচক্র, কৃষিকাজ ও বনজ সম্পদের উল্লেখের মাধ্যমে প্রকৃতিকে জীবনধারণের মূল শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শরৎ চন্দ্র রায়ের মতে, -

“সাঁওতাল সমাজে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ধর্মীয় আচার ও সংগীতের মধ্যে দিয়েই সামাজিক নৈতিকতার রূপ লাভ করে। ফলে লোকগান পরিবেশ সংরক্ষণের এক অন্তর্নিহিত শিক্ষা বহন করে।”^{১২}

লোককথায় এই পরিবেশচেতনা আরও প্রতীকী ও নৈতিক রূপ লাভ করে। বহু কাহিনিতে দেখা যায়, বন উজাড়, নদী দূষণ বা পশুহত্যার মতো কর্মকাণ্ডের ফলে মানবসমাজে দুর্ভিক্ষ, রোগ বা সামাজিক বিপর্যয় নেমে আসে। এসব কাহিনি অলৌকিক কাঠামোতে নির্মিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা পরিবেশগত নৈতিকতার রূপক প্রকাশ। পি. ও. বডিং উল্লেখ করেছেন যে, -

“বনদেবতা ও প্রকৃতিআত্মার ধারণা সাঁওতালি লোককথায় মানুষের আচারণ নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে।”^{১৩}

এর মাধ্যমে প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব নয়, বরং সহাবস্থানের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

লোকপ্রবাদে পরিবেশচেতনা সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর দার্শনিক বোধে প্রকাশিত। মিতব্যয়িতা, সংযম ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ বিরোধী মনোভাব সাঁওতালি প্রবাদে বারবার প্রতিফলিত হয়। এসব প্রবাদ প্রজন্মান্তরের পরিবেশবান্ধব আচার-বিধি হিসেবে কাজ করেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের নৈতিক কাঠামো নির্মাণে সহায়তা হয়েছে। আধুনিক পরিবেশ সংকটের প্রেক্ষিতে এই লোকজ জ্ঞান বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এতে উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্যের একটি বিকল্প দর্শন নিহিত রয়েছে।

অতএব বলা যায়, সাঁওতালি লোকগান, লোককথা ও প্রবাদ একটি সুসংহত আদিবাসী পরিবেশ নৈতিকতার প্রতিফলন, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক শোষণমূলক নয়, বরং সহাবস্থানমূলক। এই লোকসাহিত্য পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দেশীয় জ্ঞানব্যবস্থার গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়ক এবং সমকালীন পরিবেশচর্চায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

কৃষিকাজ পদ্ধতি ও টেকসই জীবনযাপন : সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর কৃষি ব্যবস্থা মূলত প্রকৃতিনির্ভর, বহুমুখী ও টেকসই জীবনদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক শিল্পভিত্তিক কৃষির বিপরীতে সাঁওতাল কৃষি পদ্ধতি পরিবেশগত ভারসাম্য, সামাজিক সহযোগিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদন সক্ষমতাকে গুরুত্ব দেয়। এই কৃষি ব্যবস্থা শুধুমাত্র খাদ্য উৎপাদনের কৌশল নয়, বরং একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা।

সাঁওতালরা সাধারণত একফসলি চাষের পরিবর্তে বহু ফসলি পদ্ধতি অনুসরণ করে। ধান, ডাল, তিল, ভুট্টা ও বিভিন্ন শাকসবজি একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বা একসঙ্গে চাষ করা হয়। এর ফলে মাটির পুষ্টিগুণ বজায় থাকে এবং রোগ-পোকার আক্রমণের ঝুঁকি কমে।

“শরৎ চন্দ্র রায় উল্লেখ করেছেন যে, সাঁওতালরা কৃষিতে ফসল বৈচিত্র্য পরিবেশগত নিরাপত্তার একটি প্রধান উপাদান।”^{১৪}

রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে সাঁওতালরা প্রাকৃতিক সার যেমন গোবর, পচা পাতা এবং জৈব বর্জ্য ব্যবহার করে। এই জৈব পদ্ধতি মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা রক্ষা করে এবং ভূগর্ভস্থ জলদূষণ প্রতিরোধে সহায়ক। আধুনিক টেকসই কৃষি ধারণার সঙ্গে এই পদ্ধতি গভীর সাদৃশ্য রয়েছে, যদিও সাঁওতাল সমাজে এটি বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জমিকে বিশ্রাম দেওয়া প্রথা। সাঁওতালরা কৃষি ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় পরপর জমি পতিত রাখা হয়, যাতে মাটি তার স্বাভাবিক শক্তি ও পুষ্টি পুনরুদ্ধার করতে পারে। Nirmal Kumar Bose-এর মতে, -

“এই পতিত জমি ব্যবস্থা সাঁওতালদের পরিবেশ সচেতনতার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন।”^{১৫}

বনজ সম্পদের ব্যবহারেও সাঁওতালরা সংযমী। তারা জ্বালানি, ফলমূল ও ঔষধি উদ্ভিদ সংগ্রহ করলেও বন ধ্বংসে বিশ্বাসী নয়। নির্দিষ্ট ঋতু ও সামাজিক নিয়মের মাধ্যমে বনজ সম্পদ আহরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, যা প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম নিশ্চিত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক সংরক্ষণবাদী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সাঁওতাল কৃষি ও জীবনযাপনের আরেকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল সমবায় ভিত্তিক শ্রমব্যবস্থা। বীজ বোনা, ফসল কাটা বা ঘর নির্মাণের মতো কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা দেখা যায়। এর ফলে সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদের অসম বন্টন কমে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, সাঁওতালদের কৃষি ব্যবস্থা একটি প্রাকৃতিকভাবে টেকসই, সামাজিকভাবে ন্যায় ভিত্তিক এবং পরিবেশ বান্ধব মডেল। বর্তমান জলবায়ু সংকট ও পরিবেশ ধ্বংসের প্রেক্ষাপটে এই আদিবাসী জ্ঞানব্যবস্থা উৎস হতে পারে।

আধুনিক সংকট ও লোকজ জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা : খনি, শিল্পায়ন ও নগরায়নের বিস্তারের ফলে সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে পরিবেশগত সংকট ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করেছে। বনভূমি ধ্বংস, ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত শোষণের ফলে এই অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য ভেঙ্গে পড়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে বিপন্ন হয়ে পড়েছে সাঁওতাল সমাজের লোকজ জ্ঞান ও সংস্কৃতি, যা মূলত প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে উঠেছিল। সাঁওতাল সমাজের বন ও ভূমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক নির্ভরতার।

“রামদাস মুরমু উল্লেখ করেছেন যে সাঁওতালদের কাছে বন কেবল জীবিকার উৎস নয়, বরং সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্র।”^{১৬}

এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মধ্যে সীমিত ভোগ ও সংরক্ষণের নৈতিকতা গড়ে তুলেছিল, যা আধুনিক পরিবেশ ভাবনার সঙ্গে গভীরভাবে সাযুজ্যপূর্ণ।

কিন্তু আধুনিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই লোকজ জ্ঞানের কোনো স্বীকৃতি নেই। খনি ও শিল্প স্থাপনের ফলে বন উজাড় হওয়ায় সাঁওতালদের ঐতিহ্যগত জীবিকা ধ্বংস হয়েছে। মুরমু দেখিয়েছেন যে ভূমি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের সামাজিক স্মৃতি ও মৌখিক জ্ঞানও বিলুপ্তির পথে যায়। এর ফলে সমাজে সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা ও দারিদ্র্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী ‘অরণ্যের অধিকার’ গ্রন্থে আদিবাসী সমাজের ভূমি ও বনকেন্দ্রিক অধিকার হরণের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থা আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও পরিবেশবান্ধব জীবনচর্চাকে উপেক্ষা করে তাদের নিজস্বভূমি থেকে উৎখাত করেছে। তাঁর মতে, -

“এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিবেশ ধ্বংসের পাশাপাশি আদিবাসী সংস্কৃতির অস্তিত্বকেও সংকটে ফেলেছে।”^{১৭}

বর্তমান বৈশ্বিক পরিবেশ সংকট - জলবায়ু পরিবর্তন, বন নিধন ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস - মোকাবিলায় সাঁওতালদের লোকজ জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ দিশা দিতে পারে। বিশেষত ‘জাহের থান’ ধারণা প্রকৃতি সংরক্ষণের একটি সামাজিক কাঠামো হিসেবে কাজ করত, যেখানে নির্দিষ্ট বনভূমিকে পবিত্র বলে চিহ্নিত করা হত। এই ব্যবস্থা আধুনিক সংরক্ষণ নীতির একটি কার্যকর লোকায়ত রূপ।

বলা যায়, আধুনিক পরিবেশ সংকট মোকাবিলায় কেবল প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন যথেষ্ট নয়। লোকজজ্ঞান ও আদিবাসী অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের একটি মানবিক ও টেকসই বিকল্প পথ নির্মাণ করা জরুরি।

উপসংহার : সাঁওতালি লোকসংস্কৃতিতে পরিবেশচেতনা একটি স্বতঃস্ফূর্ত জীবনদর্শন হিসেবে গড়ে উঠেছে, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সামাজিক আচরণ, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই পরিবেশচেতনা কোনও লিখিত নীতিমালা বা তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল নয়, বরং এটি জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে গড়ে ওঠা এক প্রাকৃতিক জ্ঞান ভাণ্ডার। বন, পাহাড়, নদী, পশু-পাখি এবং উদ্ভিদ - সবকিছুকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সাঁওতাল সমাজ প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে এক গভীর নৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

সাঁওতাল সমাজে প্রকৃতি কেবল সম্পদ নয়, বরং আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা। বনভূমি তাদের কাছে জীবিকা, আশ্রয় ও ধর্মীয় পবিত্রতার কেন্দ্র। গাছ কাটার আগে অনুমতি প্রার্থনা, নির্দিষ্ট ঋতু ছাড়া শিকার না করা, জলাশয়কে অপবিত্র না করার বিধান - এসব আচারণ পরিবেশ সংরক্ষণের কার্যকর রূপ হিসেবেই কাজ করে। এখানে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের মানসিকতা অনুপস্থিত, বরং প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা খোঁজা হয়।

সাঁওতালি লোকসংস্কৃতির গান, নৃত্য, উৎসব ও লোককথায় পরিবেশ চেতনার প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঋতুভিত্তিক উৎসব কৃষিচক্রের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, যা মানুষকে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলতে শেখায়। প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে মানবজীবনের ছন্দকে মানিয়ে নেওয়ার এই প্রক্রিয়া পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হয়েছে। লোককথায় প্রায়ই দেখা যায়, প্রকৃতির ক্ষতি করলে তার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য - এই নৈতিক শিক্ষা সমাজকে পরিবেশবান্ধব আচারণে অভ্যস্ত করে তোলে।

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহারের যে ভয়াবহ চিত্র দেখা যাচ্ছে, তার পেছাপটে সাঁওতালি লোকসংস্কৃতির এই জীবনদর্শন বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। বস্তু হিসেবে বিবেচনা করেছে, সেখানে সাঁওতাল সমাজ প্রকৃতিকে আত্মীয় ও অভিভাবকের মর্যাদা দিয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে এক মানবিক ও টেকসই বিকল্প পথের সন্ধান দেয়।

এই গবেষণার উপসংহারে বলা যায়, সাঁওতালি লোকসংস্কৃতির পরিবেশচেতনা কেবল অতীতের ঐতিহ্য নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার উৎস। এই লোকজ জ্ঞান আধুনিক পরিবেশনীতি ও টেকসই উন্নয়ন ভাবনার সঙ্গে সংলাপ স্থাপন করতে সক্ষম। প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানে, সীমিত ভোগ এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার যে শিক্ষা সাঁওতালি সংস্কৃতি প্রদান করে, তা আজকের বিশ্বে নতুন করে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

অতএব, পরিবেশ রক্ষার আলোচনায় কেবল প্রযুক্তি বা আইনি কাঠামোর উপর নির্ভর না করে, লোকসংস্কৃতির অন্তর্নিহিত জ্ঞানকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। সাঁওতালি সমাজ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষ নয়, বরং সন্মান ও সহাবস্থানের পথেই মানবসভ্যতার দীর্ঘস্থায়ী ভবিষ্যৎ নিহিত। এই উপলব্ধি গবেষণাপত্রের সার্বিক আলোচনাকে একটি মানবিক ও দার্শনিক পরিপূর্ণতায় উপনীত করে।

Reference:

1. Singh, K. S. The Santals. Oxford University Press 1993, P. 112
2. Murmu Soma. Santali Lok Sanskriti : Parampara O Paribesh Chetana. Paschimbanga Adivasi sahitya Academy, 2011, P. 56
3. Bodding, P.O. The Santal Religion, Calcutta; Asiatic Society. 1929, P. 15
4. Elwin, Verrier The Religion of an Indian Tribe Bombay; Oxford University Press, 1955, P. 67
5. চট্টোপাধ্যায়, সুধীর. আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃ. ১০৩
6. Gadgil, M. & Guha, R. This Fissured Land : An Ecological History of India, Oxford University Press, 1992, P. 102-105
7. Guha, R. Environmentalism. A Global History, Oxford University press, 2000, P. 67-69
8. মজুমদার, আর. সি. সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা; দেজ পাবলিশিং, ২০১০, পৃ. ৪৫-৪৮
9. ফ্রেফসরুড, এল. ও. The Santals: Studies in Their Culture and Religion, 2nd Edition, Calcutta; Firma KLM, 1986, P. 118-121
10. Roy, S.C. The Santals, Calcutta; Bengal Secretariat press, 1912, P. 215
11. Bodding, P. O. Traditions and Institutions of the Santals, Oslo; Jacob Dybwad, P. 87
12. Roy, S. C. The Mundas and Their Country. Calcutta; Asia Publishing House, 1912, P. 87

-
১৩. Bose, N. K. The Hindu Method of Tribal Absorption. Calcutta; Science and Culture, 1941, P. 132
১৪. মুরমু, রামদাস. সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, ২০১২, পৃ. ৪৬
১৫. দেবী, মহাশ্বেতা. অরণ্যের অধিকার, কলকাতা; দেজ পাবলিশিং, ২০০১, পৃ. ৮০
১৬. মুরমু, রামেশ্বর. জাহের বঙ্গা সানতাড় ক, কলকাতা; আদিম পাবলিকেশান, ২০০৮, পৃ. ৪৫
১৭. ডঃ টুডু, কৃষ্ণচন্দ্র. খেরওয়াল আরি বাঁদি, সাঁওতালি সাহিত্য পরিষদ, রাঁচি, ২০১১, পৃ. ৯